পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

গোলটা কিন্তু সেই অসীম মৌলিকই করেন

কিছু প্রকাশ্য, কিছু গোপন, কিছু অচেতন, কিন্তু উদ্ধৃতি। একভাবে দেখলে গোটা উত্তরাধুনিকতার ধারণাটাই মূলত 'উদ্ধৃতি' নির্ভর। প্রথমে আমরা এমন একটা দীর্ঘ, সাপানো উদ্ধৃতির উদাহরণ দেখি যার মধ্যে প্রকাশ্য, গোপন ও অচেতন সমস্তই রয়েছে। বছর আটেক আগে এক সমান্তরাল বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় ইন্দ্রনীল বিশ্বাসের একটা লেখায় সুব্রত সরকারের একটা উদ্ধৃতি পাই। এরকম -

> 'যে কোন লেখাই আসলে এক ত্রিভূজ। লেখক, পাঠক ও লেখাটি এর তিন বাহু। কিন্তু রচনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর এই ত্রিভূজ থেকে লেখকের বাহুটি প্রথমে খসে পড়ে। অন্য দুই বাহু এবার যাত্রা শুরু করবে সময় থেকে মহাসময়ের দিকে। কিন্তু যাত্রা বহুদূরের হলে তো পাঠকেরা বদলে যাবেন। এমনকি হয়তো দেখা গেলো লেখাটির জন্মভাষাও বেঁচে নেই। তাহলে কি লেখাটিই একমাত্র ধ্রুব'?

এইসময় জন অ্যাশবেরির কবিতা নিয়ে এক দীর্ঘ কাব্যপ্রকল্পে সংযুক্ত আমি। অ্যাশবেরির কবিতা- ঐতিহ্য সম্বন্ধে ওঁর অনেক গবেষকের নানা বক্তব্যের সাথে মিলে যাচ্ছিলো সুব্রতর কথা। ইন্দ্রনীল যে সুব্রতকে কোট করেছিলেন এটা সুব্রত জানতেন না। সুব্রত জন অ্যাশবেরির নামও শোনেননি তখনো। অ্যাশবেরি নিজে, এই ঘটনার ঠিক এক বছরের মধ্যে আমার সাথে এক সাক্ষাতকারে ওঁর কবিতাপ্রবণতার মধ্যে এই ধরনের এক ত্রিকোণ সম্পর্ককে অস্বীকার করেন বলবো না, কিন্তু এড়িয়ে যান। নিজের কবিতার ব্যাখ্যার জায়গাটা অ্যাশবেরি কখনো নিজের কোলের দিকে টেনে নেন না, বরং আলোচকের দিকেই আরো ঠেলে দেন। প্রশ্ন হচ্ছে সুব্রত সরকারের এই ভাবনাটা কি সম্পূর্ণ মৌলিক ছিলো?

মৌলিক কাকেই বা বলা যায়? এ মহাবিশ্বে, এত দেশের মধ্যে, হাজার হাজার ভাষার মধ্যে কে কবে কী ভেবেছেন, লিখেছেন তার মৌলিকতা বিষয়ে তর্ক আমার অন্তত অবৈজ্ঞানিক ও অরুচিকর মনে হয়। সুব্রত সরকার ভেবেছিলেন তাঁর নিজের ভাবনা ১৯৯১ সালে দীর্ঘকবিতার বই 'ফারেনহাইট ৪৫১ ডিগ্রী' বইতে। জন অ্যাশবেরির কবিতার এই ত্রিকোণসত্তা ১৯৫০ দশক থেকে রয়েছে। সুব্রতর দীর্ঘকবিতার রন্ধনে ছিলো একটা সিনেমার ছত্রাক। 'ফারেনহাইট ৪৫১' ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর ছবি ১৯৬৬ সালের। ছবিটা আবার রে ব্র্যাডবেরির ১৯৫৩ সালের উপন্যাস অবলম্বনে। ব্র্যাডবেরির নানা ভাবনার সাথে ফরাসী সাহিত্যতাত্ত্বিক, ভাষাবিদ ও দার্শনিকদের তালমিল ছিলো, ওঁদের লেখার কুয়ো, পরোক্ষভাবে হলেও, ওঁর অনুপ্রেরণার জলাধার ছিলো এমন কথা শোনা যায়। বিশেষত রোলাঁ বার্থের সাথে ওঁর বেশ কিছু ভাষা ও সাহিত্যভাবনা সমান্তরাল। এই প্রেরণামালার কোনো শেষ নেই। এর শুরু খুঁজে পাওয়া যায় না। উইকিপিডিয়ার যুগে একেই 'হাইপার্‌লিঙ্ক' বা 'দীর্ঘসংযোগ' বলা যেতে পারে। কান টানলে নাক আসার গল্প, বা কেঁচো খুঁড়তে কুমীর।

রোলাঁ বার্থ

কাজেই ‘মৌলিক’তার যে কোনো মানে নেই; তার প্রেরণা যে কত সূত্র থেকে আসছে, সচেতনে এবং অচেতনে তার কোনো হিসেব লেখকের পক্ষে রাখা সম্ভব না – তাকেই তো ‘অসীম মৌলিক’ ব’লে ডাকতে আমার বরাবরের লোভ। আমাদের সকলেরই বিদ্যা আসলে অল্প, আর এই অল্পবিদ্যার পরিমিতি যাঁদের সবচেয়ে হ্রস্ব, তাঁরাই আজও ‘মৌলিক, মৌলিক’ ব’লে বলটা ধাওয়া করেন। গোলটা কিন্তু সেই অসীম মৌলিকই করেন।

রোলাঁ বার্থ বলেছিলেন,

> ‘লেখা হচ্ছে সেই নিরপেক্ষ, যৌগ, তেরছা জায়গা যেখান থেকে বিষয় বা কর্তা পিছলে বেরিয়ে যায়, সেই নাস্তিবাচক যেখানে সব পরিচয় মুছে যায়, শরীরী লেখার নিজস্ব পরিচিতি তো বটেই’।

ছেলেবেলায় ইস্কুলে আমাদের যেসব প্রশ্নের সামনে মাথার চুল ছিঁড়তে হতো তার একটা ছিলো – ‘কবি কী বলিতে চাহিয়াছেন?’। অর্থাৎ ধ’রে নেওয়া হতো (বা এখনো হয়) যে পাঠের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বিশুদ্ধ গণিতের নিয়ম মেনে, একটা প্রত্যয়ী ব্যাখ্যা তৈরি করে, লেখার পেছনে কবির সুধীর মননের একমাত্র স্থির সত্যকে উন্মোচন করা – যেন সম্পাদ্যের ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে বা যেন পাঠকের ভূমিকায় নেমেছেন সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী।

একজন গণিতপ্রেমী হিসেবে এখানে বলি গণিত যতো শুদ্ধ হচ্ছে, ততো এটাই কিন্তু প্রমাণিত হচ্ছে, বিশেষত কারিগরি গণিতে, যে এক প্রশ্নের বেশ কিছু বা অগুন্তি উত্তর হয়। আর সে উত্তর নির্ভর করে গ্রাহকের প্রত্যাশার ওপর, চাহিদার ওপর। আজকের কাব্য- প্রবন্ধকারদের অনেকেই এই সত্যান্বেষী- মার্কা ‘কবি কী বলিতে চাহিয়াছেন?’ প্রশ্নোত্তরের অবসান ঘটিয়েছেন। কবিতা পাঠক পড়েন আনন্দের জন্য, তার নিজের জীবন, মনন, অনুভূতি, জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্য;

কবির জীবন, মনন নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য নয়। সেটা যাঁরা করবেন, মনে রাখবেন আপনাকেই জীবনানন্দ একহাত নিয়েছিলেন ওঁর 'সমারূঢ়' কবিতায়। কাজেই কবিতাকে জারণ করার দায়িত্ব যেমন পাঠকের, তেমনি স্বাধীনতাও।

'লেখকের মৃত্যু' নামের অতিবিখ্যাত প্রবন্ধে রোলাঁ বার্থ পাঠকজন্মের সূত্রে লেখকের মৃত্যুকে দেখেন। যেভাবে লেখকরূপী 'স্বয়ং' –এর যে দানবাকার ইগোর নিরিখে দেখা হতো তার সাহিত্যসৃষ্টিকে, সেই একতান্ত্রিক দর্শনকে মেরে ফেলছে পরবর্তীকাল। উত্তরাধুনিককাল। স্পষ্টতই, বার্থের এই প্রবন্ধের মধ্যে উত্তরাধুনিকতার এক বিশিষ্ট চিন্তা লুকিয়ে। অতীতের ভারতে, এশিয়ার প্রায় প্রত্যেক দেশ ও সমাজে গেলেই এটা লক্ষ্য করা যায় যে শিল্প ও অনামিতার সম্পর্ক অঙ্গুরি ও অঙ্গুলির মতো। পুরাকালের প্রায় সমস্ত গ্রন্থই – এমনকি পশ্চিমে, আফ্রিকাতে, কোনো একজন একজন লেখকের লেখা নয়। যৌথভাবে লেখা। বইয়ের গায়ে লেখকের নাম খোদাই করা নেই। ছবির ওপর চিত্রকরের সই নেই। ভাস্কর্যের নিচে নেই ভাস্করের নামখোদাই। কে জানে অজন্তা- ইলোরার দেয়ালচিত্রের শিল্পীর নাম? কে বলতে পারেন চর্যাপদের কোন পদটি কার লেখা? কতবার রামায়ণ, মহাভারত যে লেখা হয়েছে কে বলতে পারেন? কত তালমুদে মিলে লেখা হিব্রু 'জেমাত্রিয়া'। Anonymity বা অনামিতার এক জোরালো বিশ্বসংস্কৃতি ছিলো, আমাদের দেশে তো বটেই।

হঠাৎ একনায়কের মতো 'লেখক' এসে গেলেন। বার্থের মতে, 'মধ্যযুগ পরবর্তী বিলিতি অভিজ্ঞতাবাদ (ব্যক্তির অভিজ্ঞতাই তার যাবতীয় জ্ঞানের উৎস) ও ফরাসী যুক্তিবাদ... ব্যক্তির কৌলিন্যকে আবিষ্কার করে'। শুধু যে তাতে পশ্চিমী সাহিত্য/শিল্পের সংজ্ঞা বদলায় তাই নয়, সাথে সাথে তাদের সমস্ত উপনিবেশের আগাপাশতলা ঢেকে যায় এই চেতনায়। আমি যে এ লেখার শীর্ষকের তলায় নিজের নাম দিচ্ছি, এ সেই 'সাহেবই ধর্ম, সাহেবই কর্ম'- এর প্রমাণ। বারংবার যে বার্থের কথা পাড়ছি, 'উত্তরাধুনিকতা' নামক পশ্চিমী সংজ্ঞার সাহায্যে আদি ভারতের বা এশিয় সাহিত্যেকে যাচাই করে নিচ্ছি, সবই ওই সাহেবী ঝোঁক।

লেখা তাহলে কী? শিল্প কীভাবে গড়ে ওঠে। বার্থ লেখেন,

> 'লিপি গড়ে ওঠে নানা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে টেনে আনা হাজারো উদ্ধৃতির কোষকলা দিয়ে'।

ডাক্তারী শাস্ত্রে যেভাবে 'স্কিন- গ্রাফটিং' করা হয় আজ, হয়তো সেই রকমেরি এক প্রক্রিয়া। সবই কি তাহলে 'উদ্ধৃতি'?

উদ্ধৃতি – অর্থাৎ যাকে উদ্ধার করা হলো। একটা ছোট জায়গায় সে আটকে ছিলো, সেটাকেই সে বড়ো জায়গা ভাবতো হয়তো, কিন্তু যখনই সে 'উদ্ধৃত' হলো, তার একটা ভ্রমণ শুরু। সে এক জায়গা থেকে অন্যত্রে গেলো, তার জগত আপনিই বেড়ে গেলো। লেখক যা জানে, পড়ে, বোঝে, দেখে – তার থেকেই সে লেখে। এই যে তথাকথিত 'অভিজ্ঞতা' সেও তো অন্যের রচনা। সময়ের, প্রকৃতির, সমাজের, ভবিতব্যের, অন্য শিল্পীর। উপরন্তু অভিজ্ঞতা, বিশেষত আজকের সাংখ্যতিক পৃথিবীতে অভিজ্ঞতার অনেকটাই তো পরোক্ষ। ফলে, আমরা যে 'জানা'র মধ্যে অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছি তার সবটাই তো প্রায় 'উদ্ধৃতি'।

সিনেমায় নামি এবার। 'পথের পাঁচালী' ছবির যে জীবনমুখিনতা, যে মানবতা, যে দুঃখী সৌন্দর্যরস সেটা সম্পূর্ণতই বিভূতিভূষণের উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে আসছে। অথচ সারা পৃথিবী এই দেখাকে চেনে সত্যজিৎ রায়ের ছবির নামে। আবার বিভূতিভূষণ যে জীবনের গল্প বলছেন

সে কি বাঙালীর কাছে অতিচেনা নয়? সেকি ওই প্রথম লেখা হলো? একটা রূপোরঙের পর্দার ওপর অতিজটিল এক পদ্ধতির মাধ্যমে, একাধিক যন্ত্রের সাহায্যে নির্মিত এক শিল্পের একেবারে অচেনা একটা ভাষায় বলা ঐ একই কাহিনী, তার মানবতা, সঙ্গে সত্যজিতের কিছু নিজস্বপাঠ, নিজের জীবনের কিছু চেনার সাথে আঁটোসাঁটো এক মিশেল হিসেবে আমাদের সামনে আসে 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্র, যা আরেক যন্ত্রের সাহায্যে পর্দার ওপর উৎক্ষেপণ করে দেখানো হয়। আমাদের মুগ্ধতার বয়স বাড়েনা। একথা অনস্বীকার্য যে এই মহান শিল্পের প্রায় গোটাটাই এক উদ্ধৃতি। যেমন একইরকম বৃহদাকার উদ্ধৃতি কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক ছবি 'অপুর পাঁচালী'। সে ছবি 'পথের পাঁচালী' ছবির নানা 'উদ্ধৃতি' দিয়ে নির্মিত।

কয়েক বছর আগে তরুণ কবি শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফেসবুকে মৃণাল সেন সম্বন্ধে একটা আগ্রহী মন্তব্য করে – এই যে মৃণাল সেনের ছবির ভাষা কত অগ্রণী ছিলো ৭০ দশকেও। উদাহরণস্বরূপ শুভ্র 'ইন্টারভিউ' ছবির একটা দৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছিলো যেখানে মা- ছেলের সম্পর্কের অভিঘাতের মাঝে মৃণাল আচমকা 'পথের পাঁচালী'র সর্বজয়ার একটা দৃশ্য নিয়ে আসেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে এমন সরাসরি উদ্ধৃতির ব্যবহার সে যুগে হয়তো অনেকের কাছে বিভ্রান্তিকর ঠেকবে। জ্যঁ- লুক গোদারের প্রথম ছবির কথা বলি – 'আ ব্যু দে সুফ্‌লে' বা 'ব্রেথলেস'। অনেকেরই হয়তো মনে থাকবে গাড়িচোর নায়ক জ্যঁ- পোল- বেলমন্দো একটা দৃশ্যে এক সিনেমা হলের সামনে হলিউডী নায়ক হাম্ফ্রে বোগার্ট বা 'বোগি'র পোস্টারের দিকে তাকিয়ে নিজের ঠোঁটে হাত বোলায় বোগির অনুকরণে, বোগির মতো হাঁটবার চেষ্টা করে – এই গোপন উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে গোদার যে ভাবনার নিচে স্পষ্ট দাগ টেনে দেন সেটা এই যে – বেলমন্দোর চরিত্র ভাবনার পেছনে হলিউডী ছবিতে বোগার্ট অভিনীত নানা চরিত্রের একটা প্রভাব ছিলো।

মারাত্মক একটা শব্দ ব্যবহার করে ফেললাম – প্রভাব। যাকে উত্তরাধুনিক বা ২১শতকী ভাষায় আমরা 'উদ্ধৃতি' বা 'আন্তর্লিপিতা' বলবো, ২০ শতকে তাকে বলা হতো প্রভাব। এবং সেটা নেতিবাচকভাবে নেওয়া হতো। 'প্রভাব' অস্বীকার করা হতো। 'চুরি' মনে করা হতো, আজো হয়। একজন বললেন সলিল চৌধুরী ওঁর 'দিল তড়প তড়প' গানটা সম্পূর্ণতই এক পোলিশ পল্লিগীতি থেকে 'মেরে দিয়েছেন' (আজকের ভাষায় 'ঝেড়ে দিয়েছেন') । কথাটা অসত্য নয়। শচীন কর্তার বিখ্যাত হিট ছবি 'চলতি কা নাম গাড়ি'র তো প্রায় সবকটা গানই মার্কিন গায়ক আর্নি ফোর্ডের গান থেকে 'ঝেড়ে দেওয়া'। ঠিক। আর ওঁর ছেলে? রাহুল, তাঁকে যে কত লোক 'চোর' অপবাদ দিয়েছেন কতবার তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কে 'চোর' নয়? কানাকেষ্ট? হেমন্ত মুখোপাধ্যায়? নৌশাদ? লক্ষীকান্ত- প্যারেলাল থেকে আজকের প্রীতম, শান্তনু মৈত্ররা? আর সবার ওপর মানুষ সত্যের মতো যে জীয়ন্ত রবি? ওফ! তাঁর 'চুরি'র লিস্টি তো ঠাকুরবাড়ির যেকোনো বিয়ের ফর্দের চেয়ে দীর্ঘ। কাজেই ঠগ বাছতে গাঁ সত্যিই উজাড় হয়ে যায়।

পরিশেষে আশা করি বলে দিতে হবেনা যে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত এইভাবেই প্রবাহিত হয়, এভাবেই তার বৃদ্ধি। সাতাশ আঠাশ বছর আগে, তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, আমাদের বিভাগীয় পুনর্মিলন উৎসবে উৎপলেন্দু চৌধুরী গাইতে এসেছেন। তখন উৎপলেন্দু বয়সে তরুণ, অধ্যাপকদের চেয়ে ছাত্রদের সাথেই ওঁর বেশি আড্ডা। গাছতলায় দাঁড়িয়ে নানা কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময় উৎপলেন্দু বললেন ওঁর একটা ধারণা জন্মাচ্ছে যে সুর নদীর ধার ধরে চলে এসেছে, জিপসী- বেদুইনদের মাধ্যমে – বাংলার কত ভাটিয়ালি ও পল্লীগীতির সুরের সাথে আশ্চর্যভাবে মিলে যায় পূর্ব- ইয়রোপের সুর। এ বিষয়ে উৎপলেন্দু সে সময়ে পি-

এইচ- ডি করছিলেন বা করবেন, এমন ভাবছিলেন। এই ঘটনার প্রায় বিশ বছর পর আবার দেখা হলো সিন্‌সিন্যাটিতে 'বঙ্গমেলা'য়। সেদিন উৎপলেন্দু মঞ্চেই গেয়ে শোনালেন কয়েকটা নমুনা। কাজেই উপরোক্ত সুরকারেরা যেমন কেউই 'চোর' নন, তেমনি 'সাহিত্য ভুঁইফোঁড় নহে'। 'মৌলিক' বলে সত্যিই কিছু নেই। সমস্ত মহৎ শিল্পই নানা 'সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' থেকে, নানা নাড়ি থেকে রক্ত টেনেছে। লেখার উৎকর্ষ এতেই বেড়েছে, টানা রক্তকে সে নিজের করেছে। সমস্ত আহরিত ঘ্রাণের, উপাদানের এক নিপুণ রন্ধনে গড়ে উঠেছে বৃহৎ শিল্প। সেই রন্ধনে যে যতো কুশলী, তিনিই ততো বড়ো শিল্পী। যিনি সেটা সবচেয়ে নিপুণভাবে করেছেন তাঁর শিল্পটাই মানুষ নেয়, তার 'চুরি'টাও আগে ধরা পড়ে। কাজেই 'উদ্ধৃতি' ব্যাপারটা উত্তরাধুনিক শিল্প- সাহিত্য ভাবনার এক মূল দাঁড়।

লেখক/কবি সত্তার গুরুত্বহ্রাসের সাথে সাথে এই 'প্রভাব'কে লুকিয়ে রাখার লাঞ্ছনা কমে আসছে। 'উদ্ধৃতি' এক অনস্বীকার্য সত্য। তাকে স্বীকার করে নেবার মধ্যে শিল্পকলার গুণমানও বাড়ে। বাড়ে শিল্পের প্রতি শিল্পীর সততা। মানুষ ছুটে যাচ্ছে এইসব কাজ দেখতে। পশ্চিমেও উত্তরাধুনিক সাহিত্যের একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'রেফারেন্স' এর ব্যবহার। সেই সমস্ত লেখাকে খুঁজে দেখা হচ্ছে যাঁরা প্রভাবকে আড়াল করেননি, 'উদ্ধৃতি'কে স্বীকার করেই নিজের লেখা শুরু করেছেন, যেমন জীবনের শেষার্ধে কমলকুমার মজুমদার ঠাকুর রামকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে নিজের কথা বলতে শুরু করতেন।

সম্প্রতি ইংল্যান্ডে ও যুক্তরাষ্ট্রে এক আইরিশ চলচ্চিত্রকারের একটা ছবি দেখনো হয় একাধিক কেবল্- নেটওয়ার্কে। বিশ্বচলচ্চিত্র বিষয়ক ১৫ঘন্টার ছবি 'The Story of Film: An Odyssey'। পরিচালক আমারই বয়সী এক অসমান্তরাল প্রবন্ধ- চলচ্চিত্রকার মার্ক কাসিন্স (Mark Cousins)। 'প্রবন্ধ- চলচ্চিত্রকার' অর্থাৎ যাকে ইংরেজীতে essay-filmmaker বলে। কাসিন্স একটা ক্যামেরা তার ভ্যানগাড়িতে তুলে, প্রায় একাই পৃথিবীর অসংখ্য দেশে, যে সব দেশ ইউরোপের সাথে জমিযুক্ত, ঘুরে বেড়িয়ে এই ছবি তুলেছেন। ২০১১ সালে ওঁর ছবি সম্পূর্ণ হয়। ছবির উদ্দেশ্য প্রকৃত সৃষ্টিশীলতার বৈশ্বিক চলচ্চিত্র- ইতিহাসকে ধরে রাখা। কলকাতাতেও এসেছিলেন, মুম্বই গিয়েছিলেন। শর্মিলা ঠাকুর, অমিতাভ বচ্চন, জাভেদ আখতারের সাক্ষাতকার যেমন নিয়েছেন তেমনি সৌমেন্দু রায়েরও। ১৯৬০ দশকে গোটা পৃথিবীর সৃষ্টিশীল ছবির কথা বলতে গিয়ে ওঁর প্রবন্ধচিত্রে কাসিন্স বড় করে ঋত্বিক ঘটকের কথা বলেন। বলেন সাক্ষাতকারেও। ঋত্বিক বিষয়ে মণি কাউলের সাক্ষাতকার নেন, মণির 'উসকি রোটি'র একটা দৃশ্যও দেখান। 'দ্য স্টোরি অফ ফিল্ম'- এ চলচ্চিত্র জগতে উত্তরাধুনিক চেতনার জন্ম নিয়ে মার্ক কাসিন্স কিছু দামী মন্তব্য করেন। এইসব নিয়ে অতি সম্প্রতি আমি মার্ক কাসিন্সের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি, কথাবার্তা যা হচ্ছে তা রোমহর্ষক।

প্রবন্ধচলচ্চিত্রকার মার্ক কাসিন্স

একটু আগে সত্যজিৎ ও মৃণালের ছবির উল্লেখের মধ্যে দিয়ে এটা দেখাতে চাইলাম যে পরিচালক মনে করুন বা না করুন, এঁদের কাজে উত্তরাধুনিকতার অনুপ্রবেশ জোরালোভাবেই ঘটছিলো। সত্যজিৎ রায়ের কৃষ্টি বিশেষ করে একেবারেই আধুনিকতার রসে জারিত, হয়তো উত্তরাধুনিকতার ভাবনার অনেকটাই উনি শেষ পর্যন্ত নিতেন না, অথচ ওঁর শেষ ছবির কথা যদি ওঠে – 'আগন্তুক'? সম্প্রতি ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় আমাকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে জানান সত্যজিৎ জীবনের শেষের দিকে খুব ক্লদ লেভি- স্ট্রাউসের লেখা পড়ছিলেন এবং চতুর্থ বিশ্ব বা আদিবাসী সভ্যতা নিয়ে ওঁর আগ্রহ তীব্র হচ্ছিলো। গোটা ফিল্মটাই এক তূনীর উদ্ধৃতির সমন্বয়। শুধু লেভি- স্ট্রাউসই নয়, নিজের জীবন থেকেও একাধিক উদ্ধৃতি ছবিতে এসেছে, সেইসঙ্গে লাগোয়া সূত্রগুলো মায় উৎপল দত্তর লিপে স্বকন্ঠে ছেলেবেলায় শেখা অষ্টোত্তরশতনাম। ছবিটা এটাই প্রমাণ করে আমাদের আত্মজীবনীর কতোটা আসলে 'উদ্ধৃতি'।

কিন্তু মার্ক কাসিন্স যেটা দেখাচ্ছেন সেটা এই যে ১৯৯০ দশকে এসে এই 'রেফারেন্সিং' রীতিমতো সচেতন এক শৈলি। এমনকি মার্কিন ছবিতেও আসছে। প্রবন্ধচিত্রে নিজের ধারাভাষ্যে কাসিন্স বলেন, 'the real flavours of this time were irony and postmodernism, the idea that there are no greater truths – everything is recycled…where we now see films quoting films, films made about films etc. '। আমি অন্য আলোচনায়, বইতে একথা অনেকবারই লিখেছি যে উত্তরাধুনিকতা ছবি তৈরির কাহিনীকে নিয়েই ছবি; সেই কবিতা যে নিজের গড়ে ওঠা সম্বন্ধে সচেতন ইত্যাদি।

ছবি তৈরির ছবি নিয়ে বলতে গেলে আবার মৃণাল সেনের কথা আসে, আসে ১৯৮০সালে মুক্তি পাওয়া 'আকালের সন্ধানে' ছবিটার কথা। ভারতীয় চলচ্চিত্র যেসব জায়গায় অগ্রণী, 'আকালের সন্ধানে' তার একটা বড়ো অধ্যায়। ছবিটা বার্লিনে দ্বিতীয় পুরস্কার পায় শুধু তাই না, বছর তিনেক আগে সিনসিন্যাটি শহরে আমাদের বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে ধৃতিমান যখন ছবিটার কয়েক টুকরো দেখালেন, স্থানীয় মার্কিন দর্শকের অনেকেই আমার কাছে, প্যাট ক্লিফর্ডের কাছে এসে পুরো ছবিটা দেখানোর অনুরোধ জানায়। দুঃখজনক এই যে মৃণাল সেনের কোনো ছবিই মার্কিন নাগরিকরা পাননা, ওঁর ছবি সম্বন্ধে এঁদের ধ্যান ধারণাও কম। মার্ক

কাসিন্স মার্কিন পরিচালক গাস ভ্যান সান্ট- এর (Gus van Sant) কিছু ছবি উল্লেখ করেন, যেখানে অত্যন্ত সচেতনভাবে, শৈলি হিসেবেই এই আন্তর্লিপিতা আসছে। যেমন হাঙ্গেরিয় পরিচালক বেলা তারের ছবি 'satantango' ছবিতে একটা দৃশ্যে উড়ন্ত আবর্জনার মধ্যে পেছন থেকে দুজন লোকের হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য তোলেন তার। গাস সান্ট প্রায় তার অনুকরণে 'Gerry' ছবিতে একটি দৃশ্য ব্যবহার করেন, যা এক সচেতন সিনেম্যাটিক উদ্ধৃতি ভিন্ন কিছু নয়। প্রায় একই কায়দায় উনি 'Last Days (2005)' ছবিতে শাঁতাল একারম্যানের বিখ্যাত, অতিচর্চিত ছবি

বেলা তারের 'সাতানতাঙ্গো'

গাস সান্টের 'জেরি'

'Jeanne Dielman' - এর কিছু ফ্রেমের বাঁধুনি নকল করেন। গাস ভান্ট সম্বন্ধে মার্ক কাসিন্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উক্তি কিন্তু ভিন্ন। অ্যালফ্রেড হিচককের ১৯৬০ সালের ছবি 'সাইকো' অনুকরণে সান্ট একটা ছবি করেন ১৯৯৮ সালে। একদম একই নাম, একই কাহিনী, শট- কে- শট একভাবে তোলার চেষ্টা। এবং এই হুবহু নকল করতে গিয়ে গাস সান্ট স্বীকার করেন, 'আমরা টের পেলাম যে একেবারে হুবহু নকল কখনোই করা যায় না, কোথাও না কোথাও শিল্প আলাদা হয়ে যায়'।

সুতরাং উদ্ধৃতির মানে কিন্তু কেবল 'রিমেক' নয়। 'রিমিক্স' নয়। এর অর্থ শিল্পসূত্রকে স্বীকার করা নেওয়া। আজকের জীবনানন্দ মহানন্দে স্বীকার করে নেবেন যে তাঁর বেশ কিছু লেখার নেপথ্যে উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস নামে এক কবির অবদান রয়েছে। এই 'সূত্রগোপন' করে রাখার সবচেয়ে কম প্রবৃত্তি ৩০ দশকের বাঙালী কবিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বিষ্ণু দে- র মধ্যে। পশ্চিম ও দেশীয় শিল্প- সংস্কৃতির অসংখ্য 'রেফারেন্স'- এ ভারী বিষ্ণু দে- র কবিতা। স্বভাবতই মধ্যমেধার বাংলা সাহিত্য তাকে ঠিক নিতে পারেনি। এছাড়াও সরাসরি 'উদ্ধৃতি'র ব্যবহার রয়েছে। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় একবার বিষ্ণু দের কবিতায় রবির পংক্তির উদ্ধৃতিচিহ্নহীন 'রিডিমিং' ব্যবহার দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। নিজের কবিতা লিখতে লিখতে বিষ্ণু দে সহসা লিখে ফেললেন – 'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে/ রজনীগন্ধা বনে'। উদ্ধৃতিচিহ্ন ছাড়াই।

== ।। ==

প্রথম প্রকাশঃ কবিসম্মেলন, জুন ২০১৪